দিগন্ত ফোঁড়া আলোর ঘোড়সওয়ার:
অসীম রায়ের একটি প্রথাবিরোধী ছোটগল্প

আনন্দময় রায়

১. 'গল্পের ভাষা বোধহয় যতো নিরাভরণ কম কাব্যগন্ধী হয় ততোই তা বর্তমানের জটিল বাস্তবকে ধরার পক্ষে উপযুক্ত। অনেক সময় ভাষার এক্সপেরিমেনটের খেলায় সত্য তলিয়ে যায়; ম্যানারিজমের কুহকে চরিত্রের অবয়ব অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আর সত্যকে ধরার প্রাণপ্রণ চেষ্টাই তো লেখকের আত্মবিকাশের একমাত্র পথ।' **['গল্প কেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁরর উত্তরাধিকার, অসীম রায়। পৃ:২৫৫]**

১৯৪৬ সালের ''the great calcutta killing'', সেই নৃশংস অমানবিক - অসূয়াপ্রসূত হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বছরখানেকের মদ্যে দেশভাগ, কবিতা থেকে গদ্যে নিয়ে এল অসীম রায়কে। যে তুমুল তুলকালাম, অসীম রাযের কথায় ''এত বড় বিরাট ওলোটপালটের চ্যালেঞ্জ যা আমাদের দেশের ইতিহাস ভুগোল অর্থনীতি সংস্কৃতি সব কিছুই ওলোটপালট করে দেয়'' ('গল্প কেন', **রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকার**, অসীম রায়, পৃঃ ২৫১) তার ভেতর দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সমস্ত কবিতা কঠিন, কঠোর গদ্যময়তার চোরাবালিতে পথ হারায়, পথ হারাতে বাধ্য। কাগজের সাংবাদিক হয়ে, ১৯৬৭'র নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল পরাজয় ও বামপন্থীদের প্রচণ্ড উত্তেজনা - প্রত্যাশার মাঝে একটি গোটা রাত কলকাতার পাঁচ মাথার মোড়ে কাটিয়ে, বুঁদ হয়ে বসে রইলেন বাড়িতে দুটি দিন। জন্ম নিলো প্রথম গল্প 'আরম্ভের রাত'। অসীম রায়ের নিজের লেখায়, ''সে সময়টা ছিল ঝড়ের দিন। চারপাশে এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যাকে টেনে বড় করা যায় না অথচ যার তীব্রতা সারা মন আচ্ছন্ন করে। লাল বাজারে পুলিশের এক কর্তার সঙ্গে দেখা করার পর দেখি দোতলায় বারান্দায় সারি সারি উদ্বিগ্ন তরুণ দাঁড়িয়ে। এখনই তাদের জেরা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের মধ্যে আমাদের নিজের মুখটাও দেখতে পেলাম। ফিরে এসে 'অনি' গল্প লিখি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেশ পত্রিকার দেবার জন্য গল্পটা নিয়ে যান। সচরাচর আশ্চর্য ঘটনা ঘটে না তবে কখনো - সখনো ঘটে। গল্পটা বেরিয়ে যায় ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে নক্সাল তরুণদের পুলিসী নির্যাতনের গল্পটাই এ বিষয়ে বাংলায় প্রথম গল্প।'' [ঐ, ঐ, পৃ: ২৫৪] টানা বছর পনেরো চুটিয়ে গল্প লেখার পর প্রাক্তন স্ববিরোধ কেটে যায় অসীম রায়ের। কিভাবে যেন তা রূপান্তরিত হয় একসময় প্রথাবিরোধিতায়।

অসীম রায়ের ছোটগল্পে প্রথা বিরোধিতার কারণে যে উৎকণ্ঠ গোঁড়া ও ধার্মিক পাঠক ও লেখক উভয় মহলেই, তার কারণ অন্যত্র নিহিত। গোঁড়া ও যান্ত্রিক মার্কসবাদের খাঁচা থেকে নিজেকে মুক্ত করে, চিরায়ত, বিষয়বাদ মার্কসবাদের মুক্ত ভাবনার ধারার সাথে নিজেকে যুক্ত করেছেন অসীম। নিঃসন্দেহেই যা বহুমাত্রিক ও বহুবিস্তৃত। তাঁর প্রথাবিরোধী গল্পের আঙ্গিক ও নিহিতার্থ, একটিমাত্র রেখায় অবস্থান করে চমৎকারভাবে। গল্পের নিজস্ব ভাষায়, এর ফলে আপনা থেকেই গড়ে ওঠে, নিয়ন্ত্রণধর্মী, ক্ষমতাশ্রয় মানসিকতা। আর এই মানসিকতা আর-কিছু নয় ঃ সমাজতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার। অসীম রায় মন্তব্য করেছিলেন, ''গল্পের ভাষা বোধহয় যতো নিরাভরণ কম কাব্যগন্ধী হয় ততোই তা বর্তমানে জটিল বাস্তবকে ধরার পক্ষে উপযুক্ত। অনেক সময় ভাষার এক্সপেরিমেন্টের খেলায় সত্য তলিয়ে যায়; ম্যানারিজমের কুহকে চরিত্রের অবয়ব অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আর সত্যকে ধরার প্রাণপণ চেষ্টাই তো লেখকের আত্মবিশ্বাসের একমাত্র পথ।'' [ঐ, প: ২২৫]

উপরোক্ত মন্তব্যের ঠিক এক বছরের মাথায় লেখা হয়েছে 'মিঠু ভুটু সেক্সপীয়র।' একটি বামপন্থী সরকার, অনেক অশ্রু - রক্ত নির্যাতন - হাহাকার - অস্থিরতার বিনিময়মূল্যে, ইতিমধ্যে ক্ষমতায় আসীন ও ইতিমধ্যেই পেরিয়ে এসেছে আট - আটটি সম্ভাবনাময় বছর। প্রত্যন্ত মফঃস্বল - গ্রাম - শহর - নগর - বন্দর - প্রান্তরের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নির্মাণের শব্দ। অসীমের ছোটগল্পে কেটে যাচ্ছে ''প্রাক্তন স্ববিরোধ সম্পূর্ণ...।'' [ঐ পৃ: ২৫৪] এক নতুন তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক পরিস্থিতিতে স্থিত হচ্ছেন অসীম রায়, ''...মানুষের এই জয়যাত্রায় ভাববাদ এবং বস্তুবাদের পুনর্বিন্যাস ঘটবে জীবন দর্শনে। মায়াবাদ আর অদৃষ্টবাদের বেড়াজাল ভেঙে প্রাচীন সভ্যতার বংশধরেরা যেমন বস্তুজগতের অনির্দিষ্ট অপার রহস্য সম্পর্কে চেতনায় নতুন শ্রদ্ধা অর্জন করবে পশ্চিমের মানুষ এই আশ্চর্য গ্রহের বস্তুজগৎ সম্পর্কে। বিজ্ঞানের নবলব্ধ জ্ঞানের অঙ্গুলিনির্দেশ এই সমৃদ্ধ জীবনদর্শনের দিকে।'' [বস্তুরহস্য এবং জীবনদর্শন', **রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরাধিকার** পৃ: ২৬৯-৭০] আসলে, জাতি পরিচয়ের ঐতিহ্যে আর একবার অবগাহন। আসলে, এভাবেই বোধহয়, কতটা পেয়েছে বা কতটা পাইনি তার হিসেব -নিকেশ জাঁকিয়ে বসে ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারক। এটি উঠে আসে উৎস থেকে, এর পরিক্রমা আবহমান কাল। এক সযত্ন - লালিত লোকায়ত শিকড় থেকে বিকশিত এই উত্তরাধিকার, বলাবাহুল্য সংশয়ের কোন অবকাশ না রেখেই, বহন করে চলে অনাস্বাদিত তৃপ্তির আনন্দ। অভিজাত রুচি, নির্দ্বিধায় প্রকাশিত হয়; নিজস্ব লোকায়ত ভাষায়। নিবিড় বিশ্বাসে, পরম্পরের বাড়ানো হাত ধরে, উত্তরণের রাস্তায় হেঁটে যায় মানুষ।

নান্দীপাঠের পরিপ্রেক্ষিতেই চোখ ফেরানো যাক 'মিঠু ভুটু সেক্সপীয়র' -এর দিকে। হঠাৎ করেই যেন, প্রস্তুতি অবশ্যই রয়েছে পরম গভীরে, কাহিনী শুরু হয়ে যায় গল্পকারের একান্ত অন্তরঙ্গকতায়।

'' 'আমাকে বাজার থেকে একটা গগলিস কিনে দেবেন?'

সুনীল সেন চমকে তার দৃষ্টি ফেরাল। এতক্ষণ সে তাদের বাড়ির মাঠে বজ্রদগ্ধ মহুয়া গাছটার দিয়ে চেয়ে ভাবছিল, এই যৌবন স্ফুরণের কারণ কি? মানুষের বেলায় তো এমন হয় না।

বারো বছরের মেয়েটির এই স্থাণু লোকটির স্থবিরতা পছন্দ নয়। ঘন্টার পর ঘন্টা লোকটা চুপ করে বসে থাকে। তার এই নির্বান্ধব জায়গায় প্রাণ আইটাই করে। মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা ফ্রকপরা মেয়েটি বলে, 'বলুন না ছোড়দাকে, আমার জন্য একটি গগলিস আনবে বাজার থেকে।'

'মানে যেটা চোখে দেয় রোদ্দুরে? গগ্‌লস?'

লালের ওপর সোনালি ডোরাকাটা রুমালখানা চেটোতে থাপড়ে থাপড়ে মেয়েটি বলে, 'তাই তো বলছি।'

'কাল বলে দেব আনতে', বলেই গতকাল সন্ধে বেলা ট্রেন থেকে নেমে তাদের বাগানের গেট খুলতেই যে দৃশ্য তার নজর কেড়েছিল সেদিকে চোখ ফেরায়। গাছটা তখন ছিল বিরাট মজবুত একটা শাদা কঙ্কাল, ধবধবে হাড়ের হাত চারদিকে বেরিয়ে আছে। আর এক জাঁকাল সবুজ সুট পরে দাঁড়িয়ে হাসছে। এরকম পুনর্জন্ম বোধ হয় উদ্ভিদ জগতের সম্ভব, মানুষের জগতে ঘটে না।

মেয়েটি কিন্তু নড়ে নি। এ বাড়ির ন্যাড়া বাগানের ওপারে যে বিরাট প্রসারিত মাঠ যাকে ছোট ছেলে এরোড্রোমের মাঠ নাম দিয়েছে, সেদিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, এখানে কি মানুষ থাকে? কোনো মানুষ নেই, কিছু নেই!'

এবার সুনীল সেন রেগে বললে, 'কিছু মানে তো হিন্দি সিনেমার ঘিপঘাপ মারপিট! তোদের কেন্দ্রাপাড়ায় কি টিভি আছে? সেখানে মানুষ থাকে না?'

ওড়িষ্যার কেন্দ্রাপাড়া স্টেশনে নেমে পাঁচ মাইল বাস, তারপর মিঠুদের গ্রাম।

'কেন্দ্রাপাড়ায় টিভি নেই, কিন্তু মানুষ আছে। আমাদের পাশেই কাকাদের বাড়ির কত লোক। সন্ধের পর আমরা কত খেলি। যাত্রা হয়। মহিষাসুর বধ, পাতালকন্যা।" ['মিঠু ভুটু সেক্সপীয়র', **অসীম রায়ের ছোটগল্প,** আধুনিক ছোটগল্প গ্রন্থমালা/ ১পৃ: ৫৭]

মিঠুর ছোট্ট একটি সংলাপ দিয়েই গল্পের শুরু। এবং এরপরই সেই স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল, এক - ঝলক - হাওয়া - স্পর্শের কোমল কথোপকথন ঃ

'' 'একানে কতো ফাঁকা। কি সুন্দর ফুরফুরে পরিষ্কার হাওয়া!'

'সব বাজে! কার সঙ্গে খেলব? লুডো খেলবেন?'

'আমি?' সুনীল সেনের বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

'হ্যাঁ খেলুন না একদান। নিয়ে আসব?'

'এই শোন, তোর ভাত পুড়ে যাচ্ছে।'

'সবে তো জল চড়ালাম', বলে মিঠুর মনে পড়ে অনেকক্ষণ জল ফুটছে।" [অ, পৃ: ৫৮]

এইভাবেই শুরু হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক সুনীল সেনের কাহিনী, যেখানে মায়া বড় মনোরম, যেখানে মৃতা স্ত্রীর স্মৃতি বড় পীড়াদায়ক, যেখানে অসহায়তা চাবুক করা নির্মম হাতে, সুনীল সেন আলোড়িত হন সময়ের অসংযত, নির্মম প্রহারে।

সাঁওতাল পরগণার পৈতৃক ভিটেতে পা রাখার সাথে সাথেই চারদিকের একটি পরিবর্তনের ছোঁয়া, স্নিগ্ধ নয়, আগুনের রূঢ় আঁচেই মতোই গায়ে এসে লাগছে সুনীল সেনের। আর এরই মাঝে তিনি যেন আপ্লুত কিংবা বিষন্ন এক বঙ্গসন্তান। একদিকে স্মৃতির প্রহার, যা সমপৃক্ত করে রাখে তাঁর মৃতা সহধর্মিনীর সাথে হানিমুনের নির্মেদ - নির্ভার পবিত্রতা, অন্যদিকে বিশ্বায়নের কালে নয়া উপনিবেশবাদী আধিপত্যের সগর্জন উপস্থিতি। আপাতত, একবিশ তার উগ্রমূর্তি ধারণ করলেও, বিংশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকেই অনুভূত হচ্ছিল তার বুকজোড়া করাল তৃষ্ণা। তবুও কেন বার বার ফিরে আসেন সুনীল সেন? গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের ''এক নদীতে দু'বার পা দেওয়া যায় না, কারণ নদী সামনে চলছে..." [ঐ, পৃ: ৫৮] তত্ত্বের উপস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত সত্বেও? তিনি কি বুঝেও বুঝতে চান না তা?

''এক নদীতে দুবার পা রাখা যায় না এ কথাটা কাল সন্ধেবেলা তার এই সাঁওতাল পরগনার পৈতৃক ভিটেতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল। তিন বছর আগে এই বাড়িতেই মীরার হঠাৎ চলে যাওয়ার পর আবার সে এসেছে। কিন্তু গেট খুলতে না খুলতেই তাদের মালি টহলু জানিয়ে দিয়েছে তাদের পাশের ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়ি পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে। বাজারে ঢুকতেই বাঁদিকে সর্ষের তেলের ঘানির মালিক যে আবার কেরোসিনের ডিলার সিউপ্রসাদ সেই কিনেছে। টহলুকেও বলেছে, 'বাবুকে বলো না, এখন তো একা মানুষ। বালো দাম পাবে।' গোয়ালা ননু ঝা, যে স্থায়ী মিউনিসপিাল কমিশনার, সেও খোঁজখবর নিচ্ছিল।

আরও পরিবর্তন এসেছে, যে কথাটা টহলু পোষ্টকার্ডে লিখেছিল। তাদের ন্যাড়া বাগানের পূর্বদিকে যে ঝাড়াল যজ্ঞিডুমুর গাছটার ফাঁক দিয়ে এক খামচা সূর্যোদয় মেঘ না থাকলেই দেখা যায় সেদিকের পাঁচিলের মাঝখানে বিরাট অর্ধচন্দ্রাকার গর্ত যা গত তিন বছরের বর্ষায় ক্রমশ প্রসারিত। পশ্চিমের যে ঘরখানায় মীরার সঙ্গে হানিমুনে এসেছিল—যার সিঁড়িতে বক্স ক্যামেরায় তোলা সদ্যোস্নাতা মীরার ফটোখানা ক্রমশ হলুদ হচ্ছে—তার ছাদ ফেটে জল পড়ছে। রান্না ঘরের জানালার দুটো গরাদ লোপাট। আর তার গায়ে যে দুটো সূর্যাস্ত চোবানো শিশুগাছ তাদের চোখের আরাম ছিল তারা নেই। ঝোপ ঝুপে কোপ মারার সময় কখন মারোয়াড়িরা ঠিক জানে।" [ঐ, প:৫৮]

তবুও নাগরিক জীবনের অদম্য জটিলতার তুলনায় প্রাকৃতিক নির্যাস অনেক বড় অবয়বে ধরা দেয় সুনীল সেনের কাছে। জীবন উঠে আসে গভীর বিশ্বাস আর পরম মমতায়। ভিন্নতর সামাজিক পরিপার্শ্ব তাকে দাঁড় করিয়ে দেয় স্বপ্ন ও বাস্তবের সন্ধিস্থলে। সময় - সমাজ-মানুষকে যেন শব-ব্যবচ্ছেদ টেবিলে টান টান শুইয়ে চিরে চিরে বিশ্লেষণ করেন সুনীল সেন। তখন মানুষ তাঁর কাছে আর দেশ - কালের মধ্যে খণ্ডিত নয়, সব মিলিয়ে যে এক অখণ্ড সার্বজনিক অস্তিত্ব। নাগরিক জীবনের জটিল আবর্তে ছড়িয়ে থাকা এক একটি সত্বা সংহত হয়, অনেক - জটিলতর - জটিলতম চড়াই উৎরাই পেরিয়ে, বিশ্ব চরাচরের মাঝে। কৃত্রিমতাকে বাদ দিয়ে দৈনন্দিন জীবন হয়ে ওঠে স্বচ্ছ, সাবলীল, মরমী, প্রাণবন্ত।

আপাতত ঘটনার উদযাপনে ইতি ও নেতি বিচারের মধ্যে হিসেবে 'সময়' -কে বেছে নিয়েছে অধ্যাপক সুনীল সেন। তারই অঙ্গ হিসেবে মাথা চাড়া দিয়েছে এক নতুন বানিয়া শ্রেণী। তারা মাটি কেনে, বাড়ি কেনে, পারলে রক্তের সম্পর্ক-ও কেনে। তারা গোটা অঞ্চলে দালাল ছড়িয়ে দেয় এবং দালালরা অবশ্যই সমাজের নীচতলা কিংবা মধ্যতলা থেকে উঠে আসে অনন্ত অর্থের অপার লিপ্সায়। কেরোসিন তেলের ডিলার শিউপ্রসাদ কিংবা স্থানীয় মিউনিসিপাল কমিশনার গোয়ালা ননু ঝা এই শ্রেণীর কোনো একটি ধাপে জায়গা করে নিতে পারে অচিরেই। সুনীল সেনের করায়ত্ত এক আশ্চর্য জীবনবোধ যেখানে বিভিন্ন চরিত্র গাঁথা থাকে এক সূক্ষ্ম যোগসূত্রে। আসলে এরা তো সমকালীন প্রতিযোগিতার চাপে অবদমিত— বিকৃত চরিত্র। ইংরেজির অধ্যাপকের মধ্যবিত্ত বিপন্নতা ঘিরে আবর্তিত হয় বাঁধাধরা আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা আর সাঁওতাল পরগণা ও তার সীমান্তবর্তী এলাকার ক্লিন্ন অর্থনীতি। তবুও এক স্বতোৎসারিত মানবিক বোধ থেকে আটপৌরে ভাষা হয়ে ওঠে মোহিনী মায়াময়। মেধা ও আত্মনির্ভরতার তীব্রতা সুনীল সেন অনুভব করেন ঃ ঘাত - প্রতিঘাত, তিক্ত - মধুর অভিজ্ঞতা বদল ঘটায় মানব চরিত্রের। বৃত্তের মধ্যে ঘোরে এই জীবনটাও, পৃথিবীর মতো একেবারে।

''এতক্ষণ এরোড্রোম মাঠের ওপারে মেঘলা থাকায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। এখন রোদ পড়তেই লম্বা মাটির টিপি চোখে পড়ে। পিঁপড়ের মতো কালো কালো বিন্দু তার গায়ে ওঠা নামা করছে।

'ওটা কি? আগে তো দেখি নি। এ টিপি এল কোত্থেকে?'

'কোনটা?' টহলু জানলার কাছে এসে বললে, 'ধানবাদ থেকে রাস্তা হচ্ছে, নদীতে ব্রিজ বানানো হবে। ধানবাদের রাজা সাহেব এখানে এসেছে। বলেছে সব বাঙালি বাড়ি কিনে নেবে।'

'রাজাসাহেব? ধানবাদে তো কোনো রাজা নেই।'

'মস্ত লোক। লোকে বলে চোরাকারবারী, আমি জানি না। এখানে তিনখানি বাড়ি কিনেছে। কলকাতার কাগজে নাম বেরিয়েছে। সবাই রাজা সাহেব বলে ডাকে।'

টহলু স্থানীয় গেজেট। আরও কিছু মৃত্যুর, আরও কিছু বাড়ির হাতবদল এবং মহুয়ার ট্যাবলেট মিলিয়ে সাঁওতালরাও যে ব্যবসা

শুরু করেছে সে প্রসঙ্গ। কিন্তু সুনীল সেন উসখুস করে। ট্রেনে আসার সময় একটা বইয়ে হাত দিয়ে বেশ কিছুদূরে এগোন গিয়ে ছিল। বিশেষ করে অণ্ডাল স্টেশনে হঠাৎ কামরাটা খালি হয়ে পড়ে, 'সেক্সপীয়রের সময়চেতনা' -র দিকে হাত বাড়ায় সে।

'রাজকুমারের দুধের জন্য বলব?'

কোলের ওপর বইখানা টেনে নিয়ে সুনীল সেন বলল, 'দরকার নেই। গুড়ো দুধের টিন এনেছি।' ' [ঐ, প: ৫৫৯]

এরপর একের পর এক, কোলাজের মতো, অধ্যাপকের গাঢ় অভিমান, প্রচ্ছন্ন শ্লেষ, শিশুসুলভ সারল্য আর সব মিলিয়ে উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস। এরই মাঝে স্পষ্ট হয়ে যায় জটিলতার মর্ম ছোঁয়ার প্রয়াস।

'মিঠু ভুটু সেক্সপীয়র' গল্পের (অবস্যই বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রথা বিরোধী প্রয়াস) অন্তর্জগতের নায়ক অপ্রতিরোধ্য সময় যার যাবতীয় মানবিক সম্পর্কের ভেতরে (সংহারক সত্ত্বেও) ক্রিয়াশীল সূক্ষ্ম অনুভূতিমালা। সম্পর্কাতীত এই অনুভূতিমালায় রয়েছে মানুষ পরিবর্তনের পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস। আর বহির্জগতে নানা দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে (relations) অবিরাম লড়তে থাকা অপর নায়ক অধ্যাপক সুনীল সেন। এ দু'য়ের মাঝে মাথা চাড়া দেবার গুমোর ছোট ছেলে ভুটুর। ''ফুটবলার - থোড়া ভুটুর, তার ওপর বাদামি সিল্কের লোম। সে দিকে চেয়ে ভুটুর বাবা চোখ নামায়। তিরিশ বছর আগে ঠিক মেকি ত্বকের মহিমা ছিল তার থোড়ায়।" [ঐ, পৃ: ৬০] অন্তর্জগতের নায়ক বার বার তার সংহারক রূপের সামনে ঘাড় ধরে দাঁড় করায় বহির্জগতের নায়ককে, তাঁর আত্মজ নির্মম কণ্ঠে ঘোষণা করে, ''আমরা যেখানেই থাকি, এটা স্পষ্ট, তোমাদের এই সব সেক্সপীয়র, টেক্সপীয়র দিয়ে কিছু হবে না। আমাদের অন্য জিনিস চাই।" [ঐ] একদিকে যেমন : ''সময়ের যে সংহাররূপ সেক্সপীয়র তার সনেটে দেখিয়েছে, যে পাতাগুলো সে অণ্ডাল স্টেশনে পড়তে শুরু করেছিল সেগুলোর থেকে। সুনীল সেনের মনে হয়, নতুন সময়কে বুঝতে নতুন বাকপ্রতিমার প্রয়োজন। সনেটগুলোর সৌন্দর্যের সঙ্গে বড্ড বেশি ফুলের উপমা। এই পেলব সৌন্দর্য নিয়ে বাড়াবাড়ি কারণ এখন তার মনে হচ্ছে ষোড়শ শতাব্দীতে অ্যান্টিবায়োটিক ছিল না। বলে লোকেরা পটাপট মরে যেত। যে মাসে কুঁড়ি, ডারলিং বাডস অফ মে, হঠাৎ দুরন্ত হাওয়ায় ঝরে যায়। কিন্তু আধুনিক জীবনের সৌন্দর্যের প্রতীক বোধ হয় তাদের গেটের লাগোয় মহুয়া গাছ, কত তিন বছরে যার শাদা হাড় ঢেকে গিয়েছে ঝাপড়া সবুজ পাতায়।

তা ছাড়া সংহার মূর্তি বাদেও সময়ের আর একটি মূর্তি আছে। মীরা চলে যাবার পর সে দরজা বন্ধ করে কুকুরের মতো কাঁদত, এখন কাঁদে না। মাস দুয়েক পর লোকবাজারে সে আবার প্রথম যেদিন গেল সেদিন দেখলে নড়া ট্যাংরা উঠেছে, চড়া দাম। কিনবার সময় আশেপাশে সে চেয়ে দেখছিল। তাকে কেউ দেখছে কিনা। সে যেন চুরি করে পৃথিবীর রূপরসগন্ধ আবার আহরণ করছে। মৃত্যু আর জীবন, ধ্বংস আর সৃষ্টি দুটো এত গলাগলি হয়ে দাঁড়িয়ে যে আলাদা করা যায় না। সময় একেবারে পরিপূর্ণ সংহারক হবে যেদিন আণবিক যুদ্ধে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। যখন আর কোনো প্রাণ থাকবে না, উদ্ভিদ জন্মাবে না, আবার সেই কোটি বছর আগের সৃষ্টি পরিক্রমা অন্যদিকে। সে জানে তার বাবা তার মামনির ''...বাইপাস সার্জারির কেস" [ঐ, পৃ: ৬১] সত্ত্বেও ''...তাকে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে" [ঐ] নিয়ে এসেছেন ''...যেখানে দু-মাইলের মধ্যে ডাক্তার নেই, সেখানে সন্ধ্যের পর ছিনতাইয়ের ভয়ে ডাক্তাররা আজকাল বেরয় না।" [ঐ] অধ্যাপক সুনীল সেনের শূন্যতা বোধের অনুভব মাত্রা পায় এখানে। এটা তো ঠিক ঃ জীবনের শূন্যতাই আমাদের চালিত করে শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে, উদ্বুদ্ধ করে সৃজনশীলতায়। যেখানে নির্মোহই একমাত্র সৃজনশীল সত্য, একমাত্র অবলম্বন, সখানে নির্মাণের উপযোগীতা গৌণ হয়ে যায়।

ভুটুর কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয় যেন বিশেষ এক বার্তা। যে চিহ্ন ধরে এই বার্তা অধ্যাপক সুনীল সেনের কাছে পৌঁছায় তা তীব্র সোচ্চার - বাঙ্ময়।

'' 'আমি বলছি না, তুমি পয়সা বাঁচাবার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছিলে। এটা একটা অ্যান্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের গণ্ডগোল। এ এইসব ভাইটাই ব্যাপারে সেক্সপীয়র মিলটন দিয়ে কিছু হয় না।'

'তুই কী ঠিক করলি?' সুনীল সেন প্রসঙ্গ ঘোরাতে চায়।

'হাওয়ার্ড ইউনির্ভাসটিটির অফারটা ভালো। কলকাতা ফিরেই জানিয়ে দেব আমি যাচ্ছি।'

'তার মানে...'

সুনীল সেন থেমে যায়। বড় ছেলে দিল্লিতে, মেয়ে - জামাই ব্যাঙ্গালোর। ভুটুকে নিয়ে তার কলকাতার সংসার। বাপের ওপর যে যতই আছড়াক, বাপকে কেন্দ্র করেই তার জীবন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বেরিয়ে হাওড়ার একটা ফ্যাক্টারিতে কয়েকমাস ঢুকেছে। এখন আমেরিকান ইউনির্ভাসিটি থেকে এই অফার।

'ভাবছি ওখানে গিয়ে ম্যানেজমেন্ট কোর্সটাও করে নেব। এখন ম্যানেজেমেন্ট - ইঞ্জিনিয়ারদের সবচেয়ে ডিমান্ড।'

'তোরা যদি সবাই দেশ ছেড়ে চলে যাস...'

'কেন, তোমরা তো আছো। তোমরা রেডিও টিভিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে বক্তৃতা করবে, তাহলেই দেশ বেঁচে থাকবে। আমাদের কাছে, যেখানে টাকা সেখানে দেশ।' " [ঐ, পৃ: ৬১]

অসীম রায়ের ছোটগল্পে প্রতি পদে পদে প্রথাবিরোধীতার সংঘাত ও সংঘর্ষ এবং অনিবার্যভাবেই নানা মাত্রা নিয়ে, সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব অতিক্রম করে ভীষণভাবে প্রকটিত, দ্বান্দ্বিক অভিঘাত। ভুটুর চরিত্রের মধ্য দিয়েই, নির্মেদ - নির্ভার - অকারণ - দীর্ঘায়ত - নয় এমন সংলাপে স্বাতন্ত্র্য ছিনিয়ে নেয়, গল্পকারের স্থিতধী, আপন মৌলিকত্ব। এইরকম।

'' 'তুমি দেখো বাবা, যারা ওপরের দিকে ছিলাম ব্যানার্জি, ভাস্কর মেহেটা, মনজিৎ সিং কেউ এখানে নেই, খালি আমি পড়ে আছি...তা ছাড়া তুমি যা ভাবছ তা নয়, আমি ফিরে আসব।'

'সবাই তাই বলে কিন্তু ফেরে না।'

ভুটু আবার রুখে উঠল, 'কেন ফিরবে? কেন ফিরবে বল? দেশে ফিরে চাকরি প্রার্থীদের কিউয়ে একেবারে শেষে দাঁড়াবার জন্য? তা ছাড়া আমি যদি ফিরি, ফিরব পুনে বোম্বাই কিংবা দিল্লিতে, কলকাতায় নয়।'

সুনীল সেন অবসন্ন গলায় বলল, 'কলকাতার ওপর তোর এত রাগ কেন?'

'কলকাতা ইজ এ ডেড সিটি। একানে দুরকম লোক থাকে। কিছু লোক কালচার করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে আবার বিপ্লব করে, আর কিছু লোক দুনম্বরি ব্যবসা করে, আর যত হাবাতে চারদিকে থেকে ঝেঁটিয়ে এসে পড়ছে কলকাতায়।'

'এইটাই তো সব শহরের ছবি।'

'মোটেই না। আমি তো গত দুবছর নর্থ ইণ্ডিয়া সাউথ ইণ্ডিয়া ঘুরলাম। পুনে, বম্বে, চণ্ডিগর, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লি—এসব জায়গায় এলে মনে হয় একটা শহরে বাস করছি, কিছু একটা হচ্ছে। কলকাতায় কিছু হয় না। খালি অতীতের জন্যে দীর্ঘশ্বাস আর যে বিপ্লব কখনো হবে না তার জন্য স্বপ্ন।'

সুনীল সেন নিস্তব্ধভাবে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। অন্য দিনের চেয়ে আজ সে আরও আক্রমণাত্মক। তার মানে তার বিশেষ বক্তব্য আছে।' " [ঐ. পৃ: ৬১-৬২]

তাহলে কি ভুটুরা হাত মেলাচ্ছে সময়ের বিধ্বংসী অভ্যুত্থানে? প্রতিটি মুহূর্তেই, ক্ষণে ক্ষণে হয়ে উঠছে, চ্যালেঞ্জের হাতিয়ার?

''আর একথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভুটু বললে, 'টহলু কী বলছিল শুনেছ?' সুনীল সেন তেমনিভাবে তাকিয়ে থাকে।

'তোমাকেও নিশ্চয় বলেছে। যদি সুবিধে মতো দর পাও তাহলে ঝেড়ে দাও বাড়িটা, তোমার তো রিটায়ারমেন্ট এগিয়ে আসছে। তারপর তো আর এ-বাড়ি রাখা সম্ভব হবে না। দাদুমণির জামানা ছিল আলাদা, সস্তা গণ্ডার দিন ছিল। এখন বাড়িটা ঠিক মতো সারিয়ে রংটং দিতে দশ - বারো হাজার বেরিয়ে যাবে। ফালতু খরচা কেন করবে? তার চেয়ে এ-বাড়িটা বেচে সল্ট লেক কিংবা কলকাতার অন্য কোথাও...'

ছেলের কথার মধ্যে সুনীল সেন 'সেক্সপীয়রের সময়চেতনা' তুলে নিয়ে তার পাতা উল্টায় 'There's divinity that shapes our ends' হ্যামলেটের এই উক্তি অক্সফোর্ডের মাস্টারমশাই খুব জোরাল ব্যাখ্যা করেছেন।" [পৃ: ঐ, ৬২]

ভুটুদের মধ্যে অঙ্কুরিত হচ্চে এক উন্মত্ত, নাছোড় ঘৃণা ও আক্রোশজাত আত্মঘাতি বিধ্বংসী সংগ্রামের বীজ। সমস্ত প্রথাগত ভাবনাচিন্তা, কার্যক্রম এলোমেলো করে তারা ঘটিয়ে দিতে চাইছে তুমুল তুলকালাম। গল্পকারের আত্মমগ্নতাই, নিদ্বিধায় বলা যেতে পারে, ওদের মধ্যে চারিয়ে দিয়েছে প্রথাবিরোধীতার শিকড়। অন্যদিকে স্বস্থির শুশ্রুষা এনে দেয় মিঠু, বারো বছরের মেয়ে। সে সুনীলদের ভাত রেঁধে দ্যায়, স্নানের জল গরম করে, ওড়িষ্যার কেন্দ্রাপাড়া স্টেশনে নেমে পাঁচ মাইল বাস - দূরত্বে জেগে থাকা তাদের গ্রামের উদ্দীপনার গল্প করে, গাছ থেকে সদ্য সদ্য পেড়ে আনা হলদে ডাঁশা কুল রাখে সুনীলের টেবিলে আর লুডো খেলে তার সঙ্গে। সময়ের অশালীন প্রহার লম্বা, ফ্রক পরা মিঠুকে ছুঁতে পারে না। মনে হয়, সেও কি সময়ের অনন্তবাধ্যতামূলক প্রথারাজি উপেক্ষা করেছে? অস্বীকার করেছে দার্ঢ্য কোমলতায়? জীবনের আদ্যোপান্ত জটিলতা হেরে যায় তার কাছে।

মূৎসুদ্দী পুঁজি যখন করপোরেট পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়, তখনই তা আরও বেশি হিংস্র, আরও বেশি রক্ত লোপুপ, আরও বেশি লোভাতুর হয়ে ওঠে। জমির মাটির জন্য পিতৃপিতামহের বসত বাড়ির জন্য তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। সর্বভারতীয় পাটির লোকসভা প্রার্থী সুরজপ্রসাদও এই শ্রেণীভুক্ত। সুনীল সেনের পিতৃপিতামহের ভিটে কবজা করতে চায়। আর এখানেই সংঘাতের চরম সূত্রপাত। সূরজপ্রসাদের আয়ত চোখে খেলা করে মুনাফা, মুনাফা এবং মুনাফা। অধ্যাপক সুনীল সেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সূরজপ্রসাদ তার হাতখানা তুলে প্রসঙ্গান্তরে গেল।

'আমি এসেছিলাম আপনার কাছে আপনার বাড়িটা কিনতে। ভালো দাম পাবেন।'

যা তার সচরাচর হয় না, একটা বিশ্রী প্রতিবাদের আবেগ তার গলার কাছে উঠে আসে। ভুটুর দিকে তাকাতে সে চোখ ফিরিয়ে নেয়

'আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আমাদের বাবারা এই সাঁওতালপরগণায় আসতেন এখানকার জল হাওয়া ভাল বলে, পেটরোগা লোকের খিদে বাড়ে সেই জন্যে। আপনারা আসছেন কেন?'

'আপনি ঠিক বাত বলেছেন। আমরা আসছি বেবসার জন্যে।'

'এখানে ব্যবসা কোথায়?'

সূরজপ্রসাদ তার পাইপটা তুলে দেখায় এরোড্রোমের মাঠের দিকে। 'ঐখানে দেখুন। ব্রিজ বানানো চলছে। আমার একটা ট্রাকের বেবসা আছে। ব্রিজ হলে সার্ভিস খুলব। এখানে বানালে সুবিধে হবে, বাড়িটাও ভাল।'

'আমি এখনও কিছু ভাবি নি।'

'আমি আবার আসব। কোই বাত নেহি।'

নেবানো পাইপ জ্বালিয়ে সূরজপ্রসাদ উঠে পড়ে।

'আপনি যে দাম পাবেন তার চেয়ে আমি দশ পনেরো হাজার বেশি দেব।'

'ভেবে দেখব।'

বিদেশি তামাকে গন্ধ ছড়িয়ে সূরজপ্রসাদ গাড়িতে ওঠে।" [ঐ, পৃ: ৬৪-৬৫]

বারার নিরাসক্ত মনোভাব প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার করে ভুটুর মধ্যে। গল্পের শেষে ভুটুর তিনটি সংলাপ : ১. ''...তোমার এ অফার টার্ন ডাউন করা উচিত নয়। তাছাড়া..."। ২. ''সামনের বছরের মাঝামাঝি আমি হাওয়ার্ডে চলে যাব।" ৩. ''তাছাড়া বাড়ির যা অবস্থা, তাতে এখন মেরামতিতে হাত না দিলে বাড়ি ধসে পড়বে। তার মানে দশ বারো হাজার টাকা ফালতু খরচা। তার চেয়ে ..."'সেক্সপীয়রের সময়চেতনা' নাড়াচাড়া করতে করতে অধ্যাপক সুনীল সেন অমোঘ মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেন, 'বাড়ি ধসে যাক। আমি বেচব না।" [ঐ, প-: ৬৫] এই উচ্চারণের সাথে সাথেই ''...সে আরামের হাঁফছাড়ে। তারপর বালকের উল্লাসে সুনীল সেন হাঁক দেয়, 'মিঠু, তোর লুড়ো নিয়ে আয়। এক হাত খেলব।' " [ঐ] ধড়িবাজ পৃথিবী দ্যাখে সারল্যের উদ্বোধন।

অসীম রায়ের প্রথাবিরোধী গল্পের আঙিনা জুড়ে পদচারণা করে এক আশ্চর্য অনুভবের জগৎ। প্রাণবন্ত সহজ - রসাল শৈলীতে পরিবেশিত হয় জটিল মনস্তত্বের বিবরণ। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার তাগিদেই মানুষের স্বাধিকার ও চেতনার প্রতিবিম্বন ঘটে যায়। অসীমের তাত্ত্বিক, প্রায়োগিক ও নান্দনিক অবস্থানে। 'মিঠু, ভুটু সেক্সপীয়র' কাহিনীতে জীবনের জটিলতা অভিঘাতে অন্তর্ভেদী হয়ে ওঠে সুতীক্ষ্ণ সংলাপ। শব্দ চয়নের মুনশিয়ানার, একের পর এক ফুটে ওঠে, লেখক সৃষ্ট অনবদ্য চিত্রমালা। কাহিনী শরীরে, এই পণ্যবাদের দুনিয়ায় রক্তাক্ত হতে হতেও, বেজে ওঠে রোমান্টিকতার সুর। একাকার হয়ে থাকে স্মৃতিকাতরতার সাথে চাপা অভিমান, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে স্নেহ আর দূরত্ববোধের সাথে প্রেম। বাস্তব, ভবিষ্যৎ আর স্বপ্নের মায়াজালের মধ্যেই আবর্তিত হয় বসন্তের উত্তপ্ত প্রদাহ। এ যেন পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাবার ধৈর্য, যা কিনা গল্পকার অসীম রায়ের নিজস্ব দর্শন। আর এই দর্শনের লাল সড়কে হাঁটতে হাঁটতে 'মিঠু ভুটু সেক্সপীয়র', সমস্ত প্রথা ভেঙেচুরে, হয়ে ওঠে সর্বজনীন। বাংলা ছোটগল্পের মহাকাশে নক্ষত্র হয়ে ওঠে অচিরেই।